মনন

আধুনিক সমাজপটে শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর মাতৃভাবের অনন্যতা

সুব্রতা সেন

মাতৃভাবের একেবারে গোড়ার কথা হল—নিষ্কাম সন্তানবাৎসল্য। শিশু জন্মের পরে সর্বপ্রথম মাকেই চেনে এবং মায়ের সঙ্গেই হয় তার সবচেয়ে নিবিড় সম্বন্ধ। জননীমাত্রেই শিশুসন্তানের প্রতি এক অনুপম বাৎসল্য অনুভব করে থাকেন। এই বিশিষ্ট বোধের প্রকাশ কেবল মানুষী মায়ের ক্ষেত্রেই নয়, মনুষ্যেতর প্রাণিকুলেও শিশুসন্তানের প্রতি অমানবী মায়ের আকর্ষণ ও সংরক্ষণপ্রয়াসের মধ্যে আমরা তা লক্ষ করে থাকি।

আবার এই মাতৃভাব যে নারীরূপেই সীমাবদ্ধ তাও বলা যাবে না। শৈশবে মাতৃহীন শিবানন্দজী মহারাজ শ্রীরামকৃষ্ণের নিষ্কাম বাৎসল্যরস আস্বাদন করে তাঁকে মাতৃরূপেই দেখতেন। এরকম দৃষ্টান্তের সংখ্যা অল্প নয়।

তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ক্ষুদ্র মানবাঙ্কুরটিকে জননী স্বাভাবিক ত্যাগ ও ভালবাসা দিয়ে তিলতিল করে বড় করতে থাকেন। তাঁর পবিত্র মাতৃভাবের স্নিগ্ধ মাধুর্য যেমন তাঁকে ও তাঁর শিশুকে, তেমনই চারপাশের পরিবেশটিকে প্রসন্ন করে তোলে। নিষ্পাপ শিশুর মধুর হাসিতে কে না বিগলিত বোধ করে?

দিন যায়, শিশু ক্রমেই বড় হতে থাকে। সব মায়েরই আকাঙ্ক্ষা, আমার সন্তানটি যেন সবদিকে বড় হয়, ভাল হয়। সবার এই আশা পূর্ণ হয় কি? হয় না। কেন? প্রথমত, বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিপার্শ্ব সম্পর্কে শিশুর সচেতনতা বাড়ে। মাতৃকেন্দ্রিক অভিনিবেশ ক্রমেই নানাদিকে ছড়িয়ে পড়ে, নিজস্ব জগৎ তৈরি হতে থাকে, ফলে মায়ের প্রতি আগের মতো নির্ভরতা আর থাকে না। পরিস্থিতির এই পরিবর্তনে বেশিরভাগ মায়েরই এতদিনের অভ্যস্ত মানসিকতা বড়ই আঘাত পায়। কেউ কেউ অভিমানে নিজেকে গুটিয়ে নেন, কেউ বা জোর করে সন্তানের উপর অধিকার বজায় রাখতে চান। স্বভাবতই এতে সন্তানের সঙ্গে মায়ের দূরত্ব ক্রমেই বাড়তে থাকে। মা বা সন্তান কেউই কিন্তু তাতে সুখী হতে পারেন না। কালের ব্যবধানে, পরিস্থিতির চাপে শৈশবের স্নিগ্ধচিত্ততাও আর ফিরিয়ে আনা যায় না।

শুনেছি পূজনীয় স্বামী ওঁকারানন্দজী মহারাজ জনৈকা সন্ন্যাসিনীকে ঈষৎ খেদের সঙ্গে বলেছিলেন, ''ছেলেমেয়েদের জন্য কী স্কুল-কলেজ করবে? তার আগে বাবা-মায়ের জন্য

স্কুল-কলেজ করো।” যত দিন এগোচ্ছে পূজনীয় মহারাজের বক্তব্যের সারবত্তা ক্রমেই বেশি করে উপলব্ধি করা যাচ্ছে। অধিকাংশ সাধারণ জননী নিজের অজান্তেই সন্তান মানুষ করেন আসক্তি ও প্রত্যাশা-মেশা ভাবালুতা দিয়ে। ‘‘এ আমার সন্তান”—এই বোধের ফলে নিজের সন্তানকে যেমন ভালবাসেন, অপরের সন্তানকে ঠিক তেমনভাবে ভালবাসতে পারেন না। ‘‘ও আমার সন্তান নয়”—এই বোধ ভেতর থেকে তাতে বাধা দেয়। পিতামাতার আচরণ যে সন্তানের সবচেয়ে বড় শিক্ষক, সেই সত্য তাঁরা মানতে চান না বলে এর গুরুত্ব সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেন। ফলে সন্তান যখন দেখে তাদের যা করতে বলা হয় বাবা-মা নিজেরাই তা করেন না, তখন স্বভাবতই কেবল উপদেশের প্রতি নয়—যাঁর মুখ থেকে এই উপদেশবাণী উচ্চারিত হচ্ছে তাঁর প্রতিও অশ্রদ্ধা ও বিতৃষ্ণা জন্মায়।

আরও সমস্যা আছে। নিজেদের অপূর্ণ সাধ-আহ্লাদ সন্তানের মাধ্যমে পূরণ করতে চেয়ে ক্ষেত্রবিশেষে পিতামাতা ভয়ানক বিড়ম্বনা ঘটান। একটি গল্প পড়েছিলাম। একমাত্র ছেলেকে ‘বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার’ করার উদ্দেশ্যে বিদেশে পাঠানো হল। ছেলেটির ছোটবেলা থেকে আঁকার হাত। স্বপ্ন ছিল, আর্টিস্ট হবে। বাবা-মার ইচ্ছায় পড়া ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে সে কিছুতেই সফল হতে পারল না, স্বভাবতই সে তখন প্রচণ্ড হতাশার শিকার। এক বন্ধুর মধ্যস্থতায় অবশেষে বিদেশেই একটি গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতার কাজ পেল; ক্রমে গ্রামের একটি সাধারণ মেয়েকে বিবাহ করল। বিবাহের পর সে সপত্নীক দেশে এল, দেখল বাবা-মা এক বিপুল আপ্যায়নের আয়োজন করেছেন—সব আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব সেখানে উপস্থিত। ছেলেটি অবাক হয়ে শুনল নানাবিধ কাল্পনিক উপাধি ও পদমর্যাদায় তাকে গৌরবান্বিত করা হল এবং তার স্ত্রীর পরিচয় দেওয়া হল একজন গবেষণারত ছাত্রী হিসাবে। আগাগোড়া মিথ্যা সম্মানের চাপ ছেলেটি সহ্য করতে পারল না, যত শীঘ্র সম্ভব কর্মস্থলে ফিরে গেল। আরও কয়েকবছর পর তার আর-একবার দেশে আসার ইচ্ছে হল। মা-বাবাকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাল এবারে যেন মিথ্যা পরিচয়ের হাত থেকে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়। সে দেশে যেতে চায়। বড় বড় অক্ষরে উত্তর এল—‘No’।

একটি ঘটনা প্রণবেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে শোনা। রামকৃষ্ণ মিশনের কোনও একটি স্কুলে ভর্তি হয়েছে নয়-দশ বছরের একটি ছেলে। জিনিসপত্র সহ তাকে হস্টেলে পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন মা। আশ্রম চৌহদ্দির ভেতরে ঢুকে মা ছেলেকে সমানে বোঝাচ্ছেন—‘‘তোমাকে যা দিয়ে যাচ্ছি তা তোমারই জন্য। কাউকে দেবে না, কেউ চাইলেও না।” ক্রমাগত এ-হেন উপদেশ শুনতে শুনতে প্রণবেশবাবুর ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি আর থাকতে না পেরে মায়ের সামনে গিয়ে বললেন, ‘‘এতক্ষণ ধরে ছেলেকে যে-উপদেশ দিলেন তার ফলে ছেলেটি তো একটি আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর মানুষ হয়ে উঠবে। এইরকম স্বার্থপরতা কিন্তু সে আপনাদের ক্ষেত্রেও প্রকাশ করবে। প্রবীণ বয়সে তার এই আচরণ মেনে নিতে পারবেন তো?” এক্ষেত্রে মায়ের কী প্রতিক্রিয়া হল তা জানা নেই।

আর একটি ঘটনাও একটি বছর দশেকের ছেলেকে নিয়ে। ঝকঝকে স্কুল ইউনিফর্ম পরা ছেলেকে নিয়ে মা স্কুলে পৌঁছতে যাচ্ছেন। বাসে ভিড়, ছেলেটি জানলার কাছে দাঁড়াতে চায়। সকলকে ধাক্কা দিয়ে ঠেলে, বুটজুতো দিয়ে পা মাড়িয়ে, কারও ব্যাগের ভেতরের কোনও প্লাস্টিকের জিনিস সশব্দে ভেঙে ফেলে সে নির্বিকারচিত্তে জানলায় এসে দাঁড়াল। জনৈক প্রবীণা একটু উচ্চকণ্ঠেই বললেন, ‘‘দেখে তো মনে হচ্ছে কোনও নামীদামি স্কুলেই পড়ে কিন্তু এতটুকু শিক্ষা

হয়নি; এমন কিছু বাচ্চা ছেলে তো নয়, এটুকু শিষ্টাচার থাকবে না কেন?" ছেলের নিন্দা শুনে মা তো রীতিমতো বিরক্ত, বলছেন, ''তখন থেকে শুনছি, ছেলের শিক্ষা হয়নি। আমার ছেলের শিক্ষা যদি না হয়েই থাকে তাহলেই বা আপনাদের কী?" প্রবীণা উত্তর দিলেন : ''আপনার ছেলে যে কেবল আপনারই ছেলে একথা বলবার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? সে সমস্ত সমাজেরই ছেলে। সে যদি বড় হয়ে একজন প্রাতঃস্মরণীয় মানুষ হয়, সমগ্র সমাজই তাহলে উপকৃত হবে, আর যদি একজন সমাজবিরোধী হয়ে ওঠে তবে সবারই দুর্গতির একশেষ হবে।" মা কী বুঝলেন জানি না, তবে চুপ করে গেলেন।

এবার একটি ছোট্ট ঘটনা একটি নিতান্ত বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে। ছেলেটি একটা খেলার স্কুলে যায়। সেখানে একদিন একজন শিক্ষিকা বাচ্চাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করছেন, বড় হয়ে কে কী হতে চায়। নানাজনে নানা কথা বলছে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে এই ছেলেটি বলল, ''আমি মোবাইল হব।" সে কী কথা! মোবাইল হবে কেন? ''হব; আমার চেয়ে বাবা-মা মোবাইলকে বেশি ভালবাসে। আমার খুব খিদে পাচ্ছে, মা বলছে একটু দাঁড়া না। দেখছিস, ফোন করছি!"

উপরের চারটি উদাহরণ থেকে আধুনিক পিতামাতা ও সন্তানের মানসিকতার কয়েকটি দিক উন্মোচিত হয়। প্রথম গল্পটিতে সন্তানকে পিতামাতার সাধ পূরণ করতে বাধ্য করা হয়েছে। সন্তানের ইচ্ছা, প্রবণতা ও সামর্থ্যকে আদৌ মর্যাদা দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ও লোকসমক্ষে তাকে যে রীতিমতো প্রশংসাভাজন করে তোলা হল, তা একমাত্র নিজেদের অহংকার চরিতার্থ করার জন্য। এই মনোভাবের চরম প্রকাশ ঘটেছে দেশে ফিরতে ইচ্ছুক সন্তানকে নিষেধ করার মধ্যে। সন্তানস্নেহের চেয়ে ঠুনকো অহংকারের মূল্য পিতামাতার কাছে কত বেশি তা গল্পটিতে স্পষ্ট হয়েছে।

দ্বিতীয় ঘটনাটি এক জননীর ভ্রান্ত মাতৃভাবের সংকীর্ণতা প্রকট করেছে।

তৃতীয় ঘটনাটিও তা-ই। তথাকথিত অন্ধ স্নেহে সন্তানকে শিষ্টাচার শেখানো দূরে থাক, তার অশিষ্টতাকে মা রীতিমতো সমর্থন করছেন।

চতুর্থ উদাহরণটি বড়ই মর্মস্পর্শী। শিশুসন্তান বাবা-মায়ের কাছে প্রত্যাশিত স্নেহাশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে শেষে কিনা একটি নিষ্প্রাণ যন্ত্র হতে চাইছে। এই চাওয়ার মধ্যে একটি স্নেহাতুর শিশুর ব্যাকুলতা তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এইসব বাবা-মা কী করে আশা করতে পারেন যে ছেলে ভবিষ্যতে তাঁদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হবে? মা-বাবা যদি আত্মসমীক্ষা ও আত্মসংশোধনের অভ্যাস না করেন তাহলে সন্তানের প্রতি তাঁদের আচরণ যথাযথ হতে পারে না; সুশিক্ষার অভাবে সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হয় কিন্তু মানুষ হয় না, স্বামীজীর ভাষায় একটি 'moustached baby' হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শেষজীবনে বাবা-মা সন্তানদের কাছ থেকে যে-অকৃতজ্ঞতা ও অবমাননা পান, তাকে 'হায় ভাগ্যের কী নিষ্ঠুর বঞ্চনা' বলে শিরে করাঘাত করা ছাড়া আর উপায় থাকে না।

এইরকম অজস্র উদাহরণ আছে। সাধারণভাবে এখন অধিকাংশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সংসার পিতা-মাতা ও দু-একটি সন্তান নিয়ে গঠিত ক্ষুদ্রায়তন পরিবার। হয়তো সন্তানদের বাবা-মাও তাঁদের পিতামাতার একমাত্র সন্তান। মেয়েরা এখন উচ্চশিক্ষিত, নিজের যোগ্যতায় কর্মজগতে দায়িত্বপূর্ণ পদের অধিকারিণী। স্বভাবতই এঁদের আরও উন্নতি করার ক্ষমতা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা দুই-ই আছে। এদিকে যৌথ পরিবার প্রায় ভেঙেই গেছে। ছোটরা কার কাছে আশ্রয় ও প্রশ্রয় পাবে? কাজেই এখন নিঃসঙ্গ বালক-বালিকা মোবাইলের মাধ্যমে

তাদের সঙ্গী খুঁজে নিচ্ছে। মোবাইল এখন সমগ্র সমাজে প্রায় মহামারির চেহারা নিয়েছে। জনৈক শিক্ষকের কথায়, মোবাইলের নেশা মদের নেশার চেয়েও ভয়ংকর। মদ্যপানের সময় আছে, বিরতি আছে, মোবাইলের সেটুকুও নেই। মোবাইলের নেশা মস্তিষ্কের ভয়াবহ ক্ষতি করে ধীরে ধীরে সমগ্র সত্তাকে গ্রাস করে। সবাই সব জানে কিন্তু মানে না বা মানতে পারে না।

এইরকম সামাজিক পটভূমিকায় যেখানে পিতামাতা ও সন্তান—উভয় শ্রেণিই মানসিক অস্থিরতায় ভুগছে সেখানে পরমা জননীর জৌলুসহীন আপাতসাধারণ জীবনের আবেদন কতটুকু; এবং কীভাবে বর্তমান প্রজন্ম শ্রীশ্রীমায়ের দিব্য মাতৃত্ব ও বাৎসল্যের প্রতি আকৃষ্ট হবে তা সত্যিই চিন্তার বিষয়।

সন্দেহ নেই, এখন পাড়ায় পাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত সঙ্ঘ গড়ে উঠেছে, প্রায় সর্বত্রই কিছু সেবাকাজের সঙ্গে নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের জীবনচরিত আলোচনার ব্যবস্থা আছে। এতে অবশ্যই তাঁদের ভাবধারা সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। মধ্যে মধ্যে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ভক্তসম্মেলন, তাতেও বহু উৎসাহীজনের মধ্যে ঠাকুর-মায়ের ভাব প্রচারিত হচ্ছে। তবু কিছু ভাববার আছে। লক্ষ করা যায়, পাঠচক্রের সদস্য-সদস্যা এবং ভক্তসম্মেলনে সোৎসাহে যোগদানকারীদের মধ্যে অধিকাংশই পঞ্চাশোর্ধ্ব, কেউ কেউ আরও অধিক বয়সি। তরুণদের অর্থাৎ আঠারো থেকে তিরিশ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের সংখ্যা গণনার মধ্যে পড়ে না। মুখ্যত যাদের জন্য ঠাকুর-মা-স্বামীজীর আগমন, সুতীব্র যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করা, সেই তরুণরা কই তেমনভাবে তো এল না? অথচ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলন ঠাকুর নিজে শুরু করেছিলেন তরুণদের দিয়ে। সাধারণ বয়স্করা বরং তিনি 'তিনশো ছেলের মাথা খারাপ করে দিয়েছেন' বলে শঙ্কিত চিত্তে দূরেই থাকতেন।

বর্তমান সমাজের চেহারা দেখে মনে হয়, সংসারের কাজ যাদের ফুরিয়েছে, কর্মরতদের মধ্যে যাঁরা অবসর নিয়েছেন, তাঁরা এই সৎপ্রসঙ্গে নিজেদের বাড়তি সময়টুকুর সদ্ব্যবহার করছেন। অবশ্যই এটি মন্দের ভাল। পারিবারিক জীবনে কিন্তু এইসব মানুষদের তরুণ প্রজন্মকে আদর্শের পথে পরিচালিত করার সুযোগ নেই, বরং তাঁরা সন্তর্পণে তাদের এড়িয়ে চলেন। কারণ মিলবে না, মেলানো যাবে না—'জেনারেশন গ্যাপ' নাকি এতই বেশি!

পক্ষান্তরে এযুগে আমরা যারা ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাবাশ্রয়ে এসেছি, অজস্র পাঠ ও বক্তৃতা শোনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ভাবতেই হবে, আমরা কী শুনলাম এবং এর মধ্যে কতটুকু আমি আমার জীবনে কাজে লাগাতে পারি। এই কাজে লাগাবার নামই তো আধ্যাত্মিকতা। নইলে 'তবলার বোল' একটু স্মরণশক্তি থাকলেই মুখস্থ বলা যায়, তোতাপাখি তো না বুঝেই কত ভাল কথা উচ্চারণ করে থাকে। নিজের আধ্যাত্মিক জীবন রচনা ও যাপনের জন্য বেশি উপদেশ গ্রহণের তো প্রয়োজন হয় না। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় নিজেকে মারবার জন্য একটা নরুনই যথেষ্ট। এটা বললে কি খুব ভুল হবে যে আমরা প্রবীণেরা নিজেদের জীবনচর্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর-মায়ের আদর্শ ফুটিয়ে তুলতে পারিনি বলেই নবীনদের তেমন করে আকৃষ্ট করতে পারছি না? এখন দেখা যাচ্ছে, সংসারে প্রবল আঘাত পেয়ে একেবারে বিপর্যস্ত না হলে মাতৃচরণে শরণ নেওয়ার কথা বেশিরভাগ মানুষের মনে উদয় হয় না। তবে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাষায় 'সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন' বা মায়ের কথায় 'অনাঘ্রাত ফুল'টি কি একেবারেই নেই? অবশ্য আছে, যুগের জটিলতায় তা অনেক কমে গেছে। এখনও কিছু তরুণ-তরুণী নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিত্যাগ করে সমাজসেবার কাজে অংশ নিয়ে তৃপ্তি পাচ্ছে। কিন্তু একাজ যে

নিছক পরোপকার নয়, আত্মোন্নতির জন্যই কল্যাণকর—সে-বোধ তাদের মধ্যে প্রেরণা জাগায়নি। শ্রীশ্রীমায়ের মাতৃভাবের অনন্যতার বিষয় আমাদের বারবার আলোচনার প্রয়োজন আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের নিদানে চালধোয়া জল বারবার খাওয়ালে নেশা ছুটে যায়। ঐহিকতার নেশা ঘোচাবার জন্য শ্রীমায়ের ভাবামৃতের চেয়ে শক্তিশালী ওষুধ আর কোথায়?

শ্রীশ্রীমায়ের জীবন একাধারে বাস্তবতা ও আধ্যাত্মিকতার সার্থক সমন্বয়। বিচিত্র সংসারের রূঢ় বাস্তব তাঁকে যেমন অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ করেছে, অন্যদিকে তাঁর সহজাত আধ্যাত্মিকতা সর্বদাই তাঁকে অনাসক্তি ও বৈরাগ্যে সঞ্জীবিত রেখেছে। মায়ের আধ্যাত্মিকতার পরিমাপ তো কারওপক্ষেই করা সম্ভব নয়, কিন্তু লৌকিক জীবনে সদাচার ও মাতৃভাবের যে-দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গেছেন তার থেকে নিজেদের সাধ্যমতো সামান্য কিছু গ্রহণ করতে পারলেও আমরা যথেষ্ট উপকৃত হব। আশার কথা, অনেকক্ষেত্রেই মা সদাচারের কার্য-কারণও নির্দেশ করে গেছেন যাতে সন্তানদের সে-আচরণ অনুসরণ করার উৎসাহ জাগে।

হতে পারে, বর্তমান সমাজে যৌথ পরিবার ক্রমহ্রাসমান। কাজেই সংসারে নানাজনের সঙ্গে নানাভাবে মানিয়ে চলার প্রসঙ্গ আগের মতো অত নেই। তবুও মানুষ সমাজবদ্ধ জীব বলে বিভিন্ন সামাজিক সম্পর্ক তো এড়িয়ে চলতে পারে না, কাজেই আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, প্রতিবেশী—সকলের সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব থেকেই যায়। কেমন করে সে-দায়িত্ব সহজভাবে পালন করা যায়, শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণী চমৎকারভাবে তারও দিগ্‌দর্শন করায়।

মা অতি দরিদ্র পরিবারে জন্মেছিলেন। ছোট থেকেই ঘরে-বাইরে সমানভাবে তাঁকে কাজ করতে হয়েছে। গৃহস্থালির কাজের সঙ্গে ছোট ছোট ভাইদের পরিচর্যা, একগলা জলে নেমে গরুর জন্য দলঘাস কাটা, আরও নানাবিধ শ্রমসাধ্য কাজ। কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, মা কখনও একক্ষণের জন্যও বিরক্ত হননি। আবাল্য তিনি শান্ত, বুদ্ধিমতী ও উৎসাহী কর্মী। দক্ষিণেশ্বরের নহবতে তাঁর পরম ক্লেশকর জীবনচর্যা কিংবদন্তির পর্যায়ে পড়ে। যেমন আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি পিতৃগৃহে সেবা করেছেন, তেমনই আগ্রহের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভক্তদের প্রয়োজন মিটিয়েছেন। নানা অসুবিধা ও বিড়ম্বনার মধ্যে অনুভব করেছেন—আনন্দের ঘট হৃদয়ে বসানো আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের অসুস্থতার সময় একান্ত লজ্জাশীলা মা শ্যামপুকুর ও কাশীপুরে কেমনভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ গোপন করে নিরলসভাবে তাঁর সেবাকাজ চালিয়ে গেছেন তা রীতিমতো অভিনিবেশের বিষয়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলাসংবরণের পরে আক্ষরিক অর্থেই তাঁর অন্নবস্ত্রের তীব্র অভাব ঘটেছে। আমাদের দৃষ্টিতে দোষারোপ করবার যথেষ্ট কারণ থাকলেও মা সব কষ্ট নীরবে সহ্য করেছেন এবং পরম ঔদাসীন্যে বলেছেন, ''অমন ঠাকুরই চলে গেলেন, আমি আর টাকা নিয়ে কী করব?'' পরবর্তী পর্যায়ে মা যখন প্রায় পাকাপাকিভাবে জয়রামবাটীতে থাকতে লাগলেন তখন অন্নবস্ত্রের ভয়ংকর অভাব হয়তো কিছুটা মিটেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, পিতৃপরিবারের সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব তাঁর উপরে ক্রমেই গুরুভার হয়ে উঠেছে। ভাইদের কলহ, অর্থগৃধ্নুতা ও শ্রীমায়ের উপরে আর্থিক দাবির চাপ তো ছিলই। ছোটভাই অভয়চরণের মৃত্যুর পর তার শিশুকন্যা রাধারানিকে মানুষ করতে গিয়ে তার এবং তার মা উন্মাদ রোগগ্রস্তা পাগলিমামির দুঃসহ উৎপাত সারাজীবন মাকে সহ্য করতে হয়েছে। বড় ভাই প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ করেন। তাঁর প্রথম পক্ষের দুই কন্যার দায়িত্বও মাকে নিতে

হয়। এরা কেউ মায়ের দরদি ছিল না, বড় কন্যাটির শুচিবায়ু ও সংকীর্ণতা নিয়ে মাকে প্রায় সর্বদাই বিব্রত হতে হত। শ্রীমায়ের জীবনের একটি বড় অংশ এই পারিবারিক যন্ত্রণার ও তাঁর অপূর্ব তিতিক্ষার কাহিনি। মায়ের সকল জীবনীতেই তাঁর পারিবারিক বিড়ম্বনার বিষয় আলোচিত হয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত (২০১৮) স্বামী চেতনানন্দ সম্পাদিত 'প্রাচীন সাধুদের কথা'য় মায়ের দুই সেবক, রাসবিহারী মহারাজ ও অশোক মহারাজের একটি অভিজ্ঞতার উল্লেখ আছে, যেটি সুপরিচিত ঘটনা নয়। এতে স্পষ্ট হয়েছে, মায়ের ভাইদের লোভ ও অধিকারবোধ কেমন দৃষ্টিকটুভাবে প্রকাশ পেত। একবার মা কলকাতা থেকে জয়রামবাটী আসছেন। মা ব্যবহার করবেন বলে সারদানন্দজী একটা সুন্দর দামি মশারি কেনেন। জয়রামবাটী পৌঁছলে সেবক দুজন মায়ের ঘরে তাঁর জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে অন্যত্র যান। মায়ের ভাই কালীকুমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসে নতুন ঝকঝকে মশারিখানা দেখে—''দিদি, মশারিখানা আমাকে দিতেই হবে'' বলে কোনও অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই মশারি নিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেলেন। মা নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলেন। যথাসময়ে সেবকরা মায়ের মশারি টাঙাতে এসে তন্ন তন্ন করে খুঁজেও নতুন মশারিটি না পেয়ে মাকে বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। মা অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে বললেন, ''বাবা, কালী চেয়েছিল, তাই তাকে দিয়ে দিয়েছি।'' রাসবিহারী মহারাজ বললেন, ''মা, শরৎ মহারাজ আপনাকে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। আপনি একদিনও ব্যবহার করলেন না। মহারাজ কী মনে করবেন!'' মা বললেন, ''বাবা, শরৎ আর কী মনে করবে। তোমরা ওই পুরনো মশারিটাই খাটিয়ে দাও।'' সেবকরা নিরুপায় হয়ে তাই করলেন। এরপরেই তাঁরা দেখলেন, কালীমামা উঠোন দিয়ে আবার মায়ের কাছে যাচ্ছেন। তখন ওই দুই সেবক কালীমামার দুহাত চেপে ধরে বললেন, ''মামা, মায়ের মশারি কোথায়?'' মামা বলছেন, ''দিদি আমাকে দিয়েছে।'' ''দিদি আপনাকে দেননি। আপনি নিয়ে গিয়েছেন। আপনাকে মশারি ফেরত দিতেই হবে।'' সেইসময় কালীমামা চিৎকার করে উঠলেন, ''ও দিদি, তোমার সেবকরা আমায় মেরে ফেলল!'' চিৎকার শুনে মা বাইরে এসে উপস্থিত হতেই মামা সেবকদের হাত ছাড়িয়ে ঘরের দিকে দৌড়লেন, সেবকরাও তাঁর পিছনে ছুটলেন। মা সেবকদের বারণ করে ঈষৎ ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ''তোমরা সাধু। ত্যাগ-বৈরাগ্য নিয়ে থাকবে। সামান্য একটা মশারির জন্য ঝগড়া করা ঠিক নয়।''[১] সাধু ও গৃহিগণ মায়ের সংসারে একত্র থাকলেও মা সর্বদাই সাধুর পালনীয় আদর্শ রক্ষার জন্য নির্ভুল পথনির্দেশ করতেন।

শ্রীমায়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য, তিনি কখনও কারও কাছ থেকে সামান্যতম সাহায্যের প্রত্যাশা করতেন না। জীবনের প্রথমদিকে সাহায্য পাওয়ার কোনও সুযোগ ছিল না, পরিণত বয়সে যখন তাঁর সংসারে বহুজন বর্তমান তখনও তিনি মনে করতেন, গৃহের সব কাজ একা তাঁরই করার কথা। শেষের দিকে শরীর ভেঙে পড়ছে, কাজও বেড়ে যাচ্ছে, মা নিজেও এটি উপলব্ধি করছেন তবু কারও সাহায্যের প্রত্যাশামাত্র নেই। কোয়ালপাড়া থেকে এক ত্যাগী সন্তান জয়রামবাটী এসে দেখেন অসুস্থ মা দুর্বল শরীরে প্রায় পাঁচসের ময়দা নিয়ে বসেছেন, রাতে সবার জন্য লুচি হবে। বাড়িতে অনেক লোক, মহিলারাও আছেন। মাকে সাহায্য করার কিন্তু কেউ নেই। বলাবাহুল্য, অনুরূপ পরিস্থিতিতে সাধারণ গৃহিণীর ক্ষোভ ও বিরক্তি অনিবার্য ছিল। অবস্থা দেখে সন্তানটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কাজে লেগে গেলেন এবং আর একজন সন্ন্যাসী সন্তানের সহায়তায় সব কাজ শেষ করে রাত দশটায় কোয়ালপাড়া ফিরে গেলেন।

শ্রীমায়ের আত্মমর্যাদাবোধ কী অপূর্ব নীরবতার মধ্যে প্রকাশিত হত তা যুগাবতার যেমন বুঝেছিলেন তেমনটি আর কেউই বোঝেনি, বোঝার যোগ্যতাও কারও ছিল না। যেকোনওরকম অনভিপ্রেত আচরণের প্রতিক্রিয়ায় মা সর্বদা সঘন নীরবতায় নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। তাঁর জীবনকথায় এমন উদাহরণ অল্প নয়। এই প্রসঙ্গে মায়ের এক অত্যন্ত মর্মপীড়াকর অভিজ্ঞতার কথা আমরা কিছুতেই ভুলতে পারি না।

একবার জননী শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। আসামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের সামনেই ভাগ্নে হৃদয় রীতিমতো কুৎসিত ভাষায় তাঁদের অসম্মান করেন। আপাত বিস্ময়কর ব্যাপার হল, শ্রীশ্রীঠাকুর এক্ষেত্রে সামান্যতম প্রতিক্রিয়াও ব্যক্ত করেননি। সম্ভবত দিব্যদৃষ্টিসহায়ে তিনি বুঝেছিলেন, হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে বাসের দিন ফুরিয়ে আসছে, সুতরাং বৃথা বাক্যব্যয়ের আর কোনও প্রয়োজন নেই। আগে একাধিকবার ঠাকুর হৃদয়কে সাবধান করে দিয়েছেন, মাকে কটুকথা না বলতে। অহংকারের বশবর্তী হয়ে হৃদয় সেসব সাবধানবাণীতে আদৌ গুরুত্ব দেননি। এখন এত অসম্মানের ফলে শ্রীশ্রীমায়ের যদি ক্রোধের উদ্রেক হয় তাহলে হৃদয়ের সর্বনাশ অনিবার্য। স্বভাবসংযতা শ্রীমা মা কালীর মন্দিরে গিয়ে নিজের মনোবেদনাটুকুও ব্যক্ত না করে বলেছিলেন, ''মা যদি কোনদিন আনাও তো আসব।'' সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার ক্লেশ স্বীকার করতে হলেও সেইদিনই তাঁদের জয়রামবাটীর উদ্দেশে যাত্রা করতে হয়েছিল। প্রসঙ্গত জানানো যেতে পারে, শ্রীশ্রীমায়ের অসম্মানের ঘটনা ঘটেছিল ১২৮৮-র ফাল্গুন-চৈত্র মাসে আর ত্রৈলোক্য বিশ্বাসের কন্যাকে কুমারীপূজা করায় হৃদয়ের কালীবাড়ি থেকে বিতাড়ন হয়েছিল ওই বছরই জ্যৈষ্ঠমাসে—মাত্র দু-তিন মাসের ব্যবধানে।

শ্রীশ্রীমায়ের অনাসক্ত প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের যে-চিত্র উত্তরকালে ভক্ত সন্তানদের কাছে উন্মোচিত হয়েছিল তা তাঁর সারাজীবনের সম্পদ। মায়ের এক সন্ন্যাসী সন্তান স্বামী ঋতানন্দ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করেছেন : ''(মা) কত কাজই করিতেছেন, কত ঝামেলাই সহিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মুখে, চোখে বা দেহে কখনো বিন্দুমাত্র কোন চঞ্চলতার লক্ষণ নাই। অন্তর যেন সর্বদাই মহাসমুদ্রের মতো স্থির, অপ্রকম্প।''[২]

গন্ডিভাঙা মায়ের সকলের প্রতি অসাধারণ স্নেহ-ভালবাসাই যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, বৃত্তি, ধনী, দরিদ্র নির্বিশেষে সর্বশ্রেণির মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের প্রতি নিজের অজান্তেও আকৃষ্ট করেছে সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির পরে মা চৌত্রিশ বছর মর্ত্যধামে ছিলেন। এই দীর্ঘ সময়ে একদিকে যেমন পারিবারিক সমস্যা ও যন্ত্রণা থেকে কখনই অব্যাহতি পাননি, অন্যদিকে তেমনই ভক্তসন্তানদের নানাপ্রকার উৎপাত ও পাগলামি তিনি নির্বিকারচিত্তে সহ্য করেছেন। তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের স্মৃতিকথায় এই নানাধরনের পাগলামির কিছু উদাহরণ আছে। তিনি বলছেন, ''এইসব গদগদ ছেলেমি দেখে বিরক্ত হতাম, অনেক সময় হাসি চাপতে পারতাম না। এ নিয়ে মা-র সামনে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করায় একদিন তিনি বলেছিলেন, 'দুঃখী মানুষের ব্যথা কত, বড় হলে বুঝবি। তুই তো মা নোস।' শুনেছি ঠাকুর স্পর্শ করে অনেকের জীবন আমূল পরিবর্তন করে দিতেন। দেখেছি মা-র আশীর্বাদ পেয়ে কতজনের জীবনে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটে গেছে। লোভী নিস্পৃহ হয়েছে, নিষ্ঠুর দয়ালু হয়েছে, ধনগর্ব, পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার নত করেছে মাথা।... কথায় কথায় তাঁর ভাবসমাধি হত না [বলা ভাল, তাঁর সকল আধ্যাত্মিক সম্পদ তিনি সংগুপ্ত রাখতেন], ভাবমুখে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের কথাও তিনি

বলতেন না। অতি সাধারণ শুচিশুদ্ধা হিন্দুনারীর মতো স্নেহময়ী জননী ছাড়া তিনি যেন আর কিছুই নন।"[৩]

চমৎকার বাক্যবিন্যাসে সত্যেন্দ্র মায়ের স্নেহশীলতার পরিচয় দিয়ে বলেছেন, ''তিনি স্নেহময়ী ছিলেন কিন্তু স্নেহদুর্বলা ছিলেন না।" আদর্শ রক্ষার প্রশ্নে এই স্নেহময়ী জননী কেমন দৃঢ়চিত্ত হতে পারেন তার দৃষ্টান্ত দুর্লভ নয়। একদিকে পদস্খলিতা অনুতপ্তা এক নারীকে স্নেহের আলিঙ্গনে আশ্রয় দিয়ে তাকে পরম কল্যাণের পথে পরিচালিত করে তাঁর 'পতিতপাবনী' নাম সার্থক করেছেন, থিয়েটারের নটীদেরও তাঁর স্নেহদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত করেননি। অন্যদিকে সন্ন্যাসের ব্রতভঙ্গকারী কোনও অনুতপ্ত সন্তানের প্রতি তাঁর মাতৃস্নেহ সম্পূর্ণ বজায় রেখেও মা সন্ন্যাসিসঙ্ঘ থেকে নির্মম চিত্তে তাঁকে বহিষ্কার করেছেন।[৪] বিদায়কালে মাতা ও পুত্র উভয়ের চোখে জল—''দণ্ডিতের সাথে/ দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে/ সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার"—এর যেন সার্থক রূপায়ণ। বিকৃতমস্তিষ্ক অতি পুরনো ভক্তসন্তান হরিশকে রীতিমতো প্রহার করে মা সংযত করেছিলেন। এমনকী স্ত্রীকে প্রহাররত এক উগ্রস্বভাব প্রতিবেশীকে মা তীব্র তিরস্কারে নিরস্ত করতে দ্বিধা করেননি। এইসব দৃষ্টান্ত আধুনিক মায়েদের জন্য এই নির্দেশ বহন করে আনে যে, একজন মাকে কতখানি আদর্শনিষ্ঠ হতে হয় যাতে তিনি নিজের সন্তানের কাছে যথেষ্ট মর্যাদাসম্পন্ন ও শ্রদ্ধাভাজন হয়ে ওঠেন। ফলে আদর্শরক্ষার প্রেরণায় প্রয়োজনমতো কোমল ও কঠোরভাবে যখন সমস্যা সমাধান করেন তখন কঠোর ব্যবহার পেলেও সন্তান মায়ের উপর রাগ করতে পারে না, বরং নিজের অপরাধের জন্য লজ্জিত হয় এবং এর পুনরাবৃত্তি না ঘটাবার সংকল্প গ্রহণ করে।

কী অসাধারণ আদর্শনিষ্ঠা ও ব্যক্তিত্বের দৃঢ়তা মায়ের মধ্যে দেখা গেছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের বাল্যাবস্থায় ক্রমবিস্তৃতির কঠিন পর্বে মা যেভাবে হাল ধরেছিলেন তার তুলনা পাওয়া বোধকরি সম্ভব নয়। এর একটি পরিচিত উদাহরণের পুনরুল্লেখ করা দোষের হবে না। তদানীন্তন গভর্নর লর্ড কারমাইকেল কোনও বক্তৃতায় অভিযোগ করেন, রামকৃষ্ণ মিশন সেবাকাজের অন্তরালে বিপ্লবীদের আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। অনেক প্রাক্তন বিপ্লবী মঠে যোগ দেওয়ায় পরিস্থিতি বেশ একটু জটিল হয়ে উঠেছিল। একদল ভক্ত সরকারের উৎপাতের ভয়ে প্রাক্তন বিপ্লবীদের মঠ থেকে সরিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব দেন। সবাই কিছুটা উদ্বিগ্ন ও দ্বিধাগ্রস্ত। শ্রীশ্রীমা কিন্তু অসাধারণ দৃঢ়তায় জানালেন : ''ঠাকুরের ইচ্ছেয় মঠ মিশন হয়েছে; রাজরোষে নিয়ম লঙ্ঘন করা অধর্ম। ঠাকুরের নামে যারা সন্ন্যাসী তারা মঠে থাকবে, নয়তো কেউ থাকবে না। আমার ছেলেরা গাছতলায় আশ্রয় নেবে, তবু সত্যভঙ্গ করবে না।"[৫] কী সন্তোষজনক বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত! শ্রীমায়ের পরামর্শে মিস ম্যাকল্যাউডের মধ্যস্থতায় স্বামী সারদানন্দ গভর্নরের সঙ্গে দেখা করে মঠের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম, সব বুঝিয়ে দিলেন। একটি গভীর সংকট কেটে গেল। *ক্রমশ*

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ স্বামী চেতনানন্দ, *প্রাচীন সাধুদের কথা* (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০১৮), খণ্ড ১, পৃঃ ২০৯-১০

২। সংকলক : স্বামী চেতনানন্দ, *মাতৃদর্শন* (উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১২), পৃঃ ১৫০

৩। তদেব, পৃঃ ১৭৮

৪। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৭৮-৭৯

৫। তদেব, পৃঃ ১৭৯-৮০